Living the Lotus 5

Buddhism in Everyday Life

2026
VOL. 248

রিস্‌সো কোসেই-কাই শিকাগো

Living the Lotus
Vol. 248 (May 2026)

Senior Editor: Rev. Takashi Maeda
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Kanchan Barua, Protik Barua

Living the Lotus is published monthly
By Rissho Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিস্‌সো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনেরত শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিস্‌সো কোসেই-কাই। বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানাস্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা～দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুঠিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

নিজে কী করতে পারি?

রেভারেন্ট নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

মানুষ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে বাঁচার সত্তা

মানুষ স্বভাবতই পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত সত্তা; তবুও প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত শক্তি আসলে ক্ষুদ্র ও সীমিত। বলা হয়ে থাকে, যদি ভাষা ব্যবহার, উপকরণ নির্মাণ এবং সমষ্টিগতভাবে কাজ করার ক্ষমতা মানুষের না থাকত, তবে সে অস্তিত্বের সংগ্রামে জয়ী হতে পারত না, টিকে থাকাও সম্ভব হতো না। মানুষকে "সামাজিক প্রাণী" বলা হয়—কারণ আমরা পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন করি, একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করি এবং সবাই মিলে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে এক উন্নত সমাজ গড়ে তুলেছি। আমি পূর্বেও বলেছি—"পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে বাঁচাই মানুষের জন্মের প্রকৃত তাৎপর্য।" জীবনের দীর্ঘ ইতিহাসের আলোকে বিচার করলেও এই সত্য একইভাবে প্রযোজ্য। বলা যায়, মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তির মাধ্যমেই এই সত্যকে অন্তরে অনুভব করে।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যায়, ব্যক্তিগত মূল্যবোধকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতার ফলে মানুষের এক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য—পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও মিলেমিশে থাকার মনোভাব—ধীরে ধীরে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর ফলস্বরূপ অনেকে নিজের চারপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং অন্যদের প্রতি উদাসীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। "নিঃসঙ্গ মৃত্যু"-র মতো সামাজিক সমস্যাগুলো যেন এই বাস্তবতারই প্রতিফলন। দুঃখজনকভাবে, এই প্রবণতা শিশুদের জগতেও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। জাপানে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, জনসংখ্যা হ্রাসের এই সময়েও প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার সংখ্যা অতীতের সব রেকর্ড অতিক্রম করেছে—যা গভীরভাবে উদ্বেগজনক।

জীব-ইতিহাস গবেষক কেইকো নাকামুরা বহু বছর আগে এক হৃদয়স্পর্শী বক্তব্যে বলেছিলেন—"এই মুহূর্তে আমি যাদের সবচেয়ে বেশি সহায়তা করতে চাই, তারা হলো শিশুরা। আমার কাছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনের কষ্ট নিয়ে চিঠি লেখে, যেখানে তারা বলে—'আমি মরতে চাই।' ('ইকিইকি', মার্চ ২০১৫) এই কথাগুলো কেবল অতীতের নয়; বরং আজও একই বাস্তবতা আমাদের সামনে বিদ্যমান। বিদ্যালয়ে একাকীত্ব, পারিবারিক অশান্তি এবং মানসিক চাপের কারণে অনেক শিশু ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ছে, এবং "আমি বাঁচতে চাই না"—এই ধরনের ভাবনা তাদের মনে জন্ম নিচ্ছে।

প্রতিদিন নিজের জীবনযাত্রা নিয়ে আত্মজিজ্ঞাসা করা

যখন আমরা নিজেরা কোনো কষ্ট বা দুশ্চিন্তার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যাই, তখন অন্যের যন্ত্রণা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি এবং মনে হয়—"ওই মানুষটি খুব কঠিন সময় পার করছে।"কিন্তু যে অভিজ্ঞতা আমাদের নিজের নেই, সে বিষয়ে অনেক সময় আমাদের সহানুভূতিও জাগে না। আর যখন সেই কষ্ট এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে কেউ "মরতে চাই" বলে অনুভব করে, তখন সত্যিকার অর্থে তার মনের গভীর যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারে—এমন মানুষ খুবই কম।

জেন ধর্মগুরু দোগেন বলেছেন, "বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন করা মানে নিজেকেই অনুধাবন করা।" আমরা অনেক সময় মনে করি যে আমরা নিজেদেরকে ভালোভাবেই চিনি, কিন্তু বাস্তবে আমরা নিজের মনকেই পুরোপুরি বুঝতে পারি না। যখন আমরা নিজের অনুভূতিই স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে অক্ষম, তখন অন্যের হৃদয়ের কথা সত্যিকার অর্থে বোঝা যে কত কঠিন—তা সহজেই অনুমেয়।

তবে, জীবনকে ভারী ও দুর্বহ বলে অনুভব করছে সমাজের এমন তরুণ-তরুণীদের জন্য কী আমাদের কিছুই করার নেই, বিষয়টি মোটেও তা নয়।

শিক্ষাবিদ শিনজো মোরি উল্লেখ করেছেন—"জীবন যতই দুঃখময় হোক না কেন, এই পৃথিবীতে 'জীবন' লাভ করার চেয়ে বড় আশীর্বাদ আর কিছু নেই। আর এই সত্যকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করানোই প্রকৃত ধর্মের কাজ।" অন্যদিকে, জীববিজ্ঞানী নাকামুরা কেইকো গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে শিশুদের উদ্দেশে বলতে চান—"তোমরা যে এই মুহূর্তে জীবিত আছো—এটি এক অসাধারণ বিস্ময়।"উভয়েই জীবনের এই মৌলিক সত্যকে উপলব্ধি করানোর গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। নাকামুরা আরও বলেন—"নিজেদের যতটা সম্ভব পেছনে খুঁজে দেখো, তবে তোমরা সবাই সংযুক্ত হয়ে ৩.৮ বিলিয়ন বছর আগের পূর্বপুরুষের আদিম কোষে পৌঁছাবে," এই উপলব্ধি—"নিজ ও পর এক", "সকলেই এক"—মানুষের অন্তরে এমন পারস্পরিক সম্মানবোধ জাগিয়ে তোলে এবং জীবনের প্রতি সাহস ও প্রেরণা প্রদান করে।

সম্ভবত আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—আমরা কীভাবে প্রতিকূলতাকে গ্রহণ করি, জীবনের অপরিসীম মূল্যকে উপলব্ধি করি এবং কীভাবে জীবনযাপন করি, তা নিজেদের জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা। এর ফলস্বরূপ, যখন দুঃখ-কষ্টে থাকা মানুষের হৃদয়ের আর্তনাদ আমাদের কানে পৌঁছায়, তখন আমরা তাদের সাহস ও শক্তি জোগাতে পারি।

"সবচেয়ে বেদনাদায়ক বিষয় কি?"—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, "মানুষের হৃদয়ই মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।" জেন গুরু রিয়োকান বলেছেন, মানুষের সবচেয়ে বড় কষ্ট হলো যখন তারা একে অপরকে সাহায্য করে না এবং মিলেমিশে জীবনযাপন করতে পারে না। তাই আমাদের উচিত প্রতিদিন নিজেকে প্রশ্ন করা—আমার কীভাবে থাকা উচিত। পাশাপাশি, কাছের মানুষের আচরণে সামান্য পরিবর্তনও লক্ষ্য করে আন্তরিকভাবে জিজ্ঞাসা করা—"কি হয়েছে?" এই ধরনের ছোট ছোট যত্ন ও সংবেদনশীলতার পুনরাবৃত্ত চর্চাই মানুষের হৃদয়কে রক্ষা করে এবং তরুণ প্রজন্মকে গড়ে তুলতেও সহায়তা করে।

('কোসেই' মে ২০২৬ইং)

Interview

প্রতিষ্ঠাতার অর্পিত দায়িত্ব হৃদয়ে ধারণ করে, বুদ্ধের আশীর্বাদে বেঁচে থাকা।

মিস্ কায়ো মুরাকামি, শিকাগো শাখা, রিস্সো কোসেই-কাই নিউ ইয়র্ক।

২০২৫ সালের ৫ই মার্চ মূল মন্দিরে অনুষ্ঠিত "৮৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে" অত্রসংস্থার বিশিষ্ট সদস্য হিসেবে এই প্রশংসাপত্রটি প্রদান করা হয়েছিল।

সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রণাম।

আজ আমাদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠার ৮৮তম বার্ষিকী—এই পবিত্র ও আনন্দঘন দিনে আমি আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। এই শুভক্ষণে, পরম করুণাময় বুদ্ধের সম্মুখে, অভিজ্ঞতার বক্তব্য প্রদানের মূল্যবান সুযোগ পেয়ে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ ও সম্মানিত বোধ করছি।

গত বছরের ডিসেম্বর মাসে, আমি যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে পালন করা শাখা-প্রধানের দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেছি। সেই দীর্ঘ সময়ের দিকে ফিরে তাকালে অনুভব করি—বুদ্ধের কৃপায় আমি অমূল্য সম্পর্ক ও গভীর শিক্ষা লাভের মাধ্যমে কতটা ধন্য হয়েছি।

আমার জন্ম ১৯৪৫ সালের ২০ মার্চ, টোকিওর আজাবু অঞ্চলে, শিরোতোরি পরিবারের পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে আমি সর্বকনিষ্ঠ। সেটি ছিল টোকিওর ভয়াবহ বোমা হামলার মাত্র দশ দিন পরের সময়—চারদিকে অনিশ্চয়তা ও আতঙ্ক বিরাজ করছিল; কখন আবার বোমা নেমে আসবে, তা কেউ জানত না। পরবর্তীতে আমাদের পরিবার হিনো অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। এরপর ১৯৫২ সালে, আমার পিতার এক বিশ্বস্ত বন্ধু মাসুদা মহোদয়ের মাধ্যমে আমরা রিস্সো কোসেই-কাই-এ যোগদান করি। সে সময় আমার মা ৩৮তম শাখার শাখা-প্রধান নোমুরা মহোদয়ের সাথে প্রতিদিন মূলকেন্দ্রে যাতায়াত করতেন। শৈশবে, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে যখন মাকে কাছে পেতাম না, তখন সেই নিঃশব্দ ঘরে একাকীত্বে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত, আর আমি নীরবে কেঁদে ফেলতাম।

স্থানান্তরিত হওয়ার পর আমার মা সেতাগায়া ব্রাঞ্চে যোগ দেন। এই মূল্যবান ধর্মশিক্ষা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা থেকে তিনি আত্মীয়স্বজন ও স্থানীয় বাজারের দোকানগুলোতে একে একে গিয়ে মানুষকে ধর্মপথে আহ্বান জানাতেন। ঘরে ফিরে সেই অভিজ্ঞতাগুলো তিনি প্রাণবন্তভাবে আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন। ধীরে ধীরে আমার মনে গভীরভাবে স্থির হলো—"মা সত্যিই এক মহৎ ও কল্যাণকর বিশ্বাসে অবিচল আছেন।" প্রাণবন্ত ও বাকপটু মা এবং স্বল্পভাষী কিন্তু পরিশ্রমী পিতা—তাঁদের

মূলমন্দিরে অভিজ্ঞার বক্তব্য দিচ্ছেন মিস্ মুরাকামি

দাম্পত্য ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ। পরিবারকে স্নেহ ও মূল্যবোধ দিয়ে আগলে রাখা এমন বাবা-মায়ের সান্নিধ্যে আমি আনন্দ ও নিরাপত্তার মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছি।

পরবর্তীতে আমি কোসেই গাকুয়েন গার্লস স্কুলে ভর্তি হই। সেখানে ছয় বছরের শিক্ষাজীবন আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে কাটিয়েছি এবং একদিনও দেরি বা অনুপস্থিতি ছাড়াই সাফল্যের সঙ্গে পড়াশোনা সম্পন্ন করেছি। এছাড়া, মন্দিরের ছাত্র বিভাগের কার্যক্রমেও আমাকে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। পরিচ্ছন্নতা সেবাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের

মাধ্যমে আমি ধীরে ধীরে ধর্মের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করি।

স্নাতকোত্তর জীবনে আমার জন্য একটি শুভ বিবাহের আশা করেছিলেন আমার পিতামাতা। কিন্তু তাঁদের সেই প্রত্যাশার বিপরীতে, আমার মনে তখন এক ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হচ্ছিল। আমার বড় বোন তখন একজন জাপানি বংশোদ্ভূত আমেরিকানের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে শিকাগোতে বসবাস করছিলেন। সেই সূত্রে, বহুদিনের লালিত স্বপ্ন—আমেরিকায় যাওয়ার ইচ্ছা—আমার মনে দৃঢ় হয়ে ওঠে। আমি খণ্ডকালীন কাজ করার পাশাপাশি আমি ইংরেজি ভাষা শিক্ষালয়ে পড়াশোনা শুরু করি। এরপর, আমার বয়ঃসন্ধিকালের অনুষ্ঠানের জন্য কিমোনো কেনার পরিবর্তে, আমি বাবা-মাকে আমার বিমানের টিকিটের টাকা দিতে পিতামাতার কাছে অনুরোধ করি। অবশেষে, মাত্র ৫০০ ডলার নিয়েই আমি যাত্রা করি আমার স্বপ্নের শহর শিকাগোর উদ্দেশ্যে, যেখানে বড় বোন বাস করতেন।

তরুণী বয়সে আমেরিকা আমার কাছে ছিল এক অপার আকর্ষণের দেশ। চারদিকে ছিল জাঁকজমক আড়ম্বর, সৌন্দর্য ও আধুনিকতার ছোঁয়া, আর যুক্তিনির্ভর জীবনধারা ও ইংরেজি ভাষায় কথা বলার আনন্দ আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল।

সেখানেই আমার দিদির স্বামীর এক বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হয়—তিনি ছিলেন জাপানি বংশোদ্ভূত আমেরিকান, যিনি পরবর্তীতে আমার জীবনসঙ্গী হন। ছয় মাস পর আমি জাপানে ফিরে এলেও, তাঁর কাছ থেকে একের পর এক চিঠি পেতে থাকি, এবং ধীরে ধীরে তাঁর প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। অবশেষে তিনি জাপানে এসে আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি আমার চেয়ে ১৮ বছর বড় হওয়ায়, আমার পিতা এ সম্পর্কের তীব্র বিরোধিতা করেন—এমনকি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেও সম্মত হননি। তবে এই বিরোধিতাই আমাকে আরও দৃঢ় করে তোলে। শেষ পর্যন্ত আমি পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে আমেরিকান দূতাবাসে বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করি এবং ২৪ বছর বয়সে নতুন জীবনের পথে শিকাগোর উদ্দেশ্যে রওনা দিই।

কিন্তু নতুন দাম্পত্য জীবন শুরু হলেও, আমার হৃদয়ে এক গভীর অনুশোচনা জন্ম নেয়—"আমি কী ভয়ংকরভাবে পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতা করেছি!" এই ভাবনায় অশ্রুসজল চোখে দিন কাটতো। দুই বছর পর, এক বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যখন আমি দেশে ফিরে আসি, তখন যে পিতা একসময় এত বিরোধিতা করেছিলেন, তিনিই আমার স্বামীর চরিত্র ও মানবিকতায় আশ্বস্ত হয়ে নাতির জন্মে আনন্দিত হন। এরপর পিতা দু'বার আমেরিকায় আমাদের কাছে আসেন। এর মধ্যে একবার শিকাগোতে তিনি প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পান, যা তাঁর জীবনের এক অমূল্য স্মৃতি হয়ে ওঠে।

আমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে দিদির বাড়ির কাছাকাছি একটি নতুন বাসায় বসবাস শুরু করি। আমার দিদি ছিলেন অত্যন্ত মিশুক স্বভাবের; তিনি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতেন এবং প্রায়ই বন্ধুদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে একসঙ্গে চা

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠাতার কাছ থেকে শাখাপ্রধানের দায়িত্ব সম্পর্কে নির্দেশনা গ্রহন করছেন।

পান করতে করতে তাঁদের মনের কথা শুনতেন। সেই পরিবেশেই তিনি কোসেই-কাই-এর শিক্ষাও তাঁদের কাছে পৌঁছে দিতেন। পরে, প্রতিষ্ঠাতা যখন বিদেশ সফরে আমেরিকা সফর করেন এবং শিকাগোতে আসেন, তখন দিদির এই কর্মকাণ্ড সম্পর্কে শুনে তিনি বলেন—"এখানে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক নেতা নেই, তাই তোমরা সবাই মিলে যদি 'হোহোয়েমি -কাই' (স্মাইল গ্রুপ) তৈরী করো, তবে ভালো হয়।" এই নির্দেশনাই পরবর্তীতে আমাদের কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হয়ে ওঠে।

সেই সমাবেশে প্রায়ই এত মানুষ জড়ো হতেন যে ঘর ভরে যেত। তাঁদের মধ্যেই একজন ছিলেন মাতসুমোতো মহোদয়, যিনি আমার দিদির মাধ্যমে ধর্মপথে প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি প্রথম শাখা-প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এভাবেই শিকাগো শাখার প্রতিষ্ঠা ঘটে।

এরপর এটি নিউইয়র্ক ব্রাঞ্চের শিকাগো শাখা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯০ সালে আমি শাখা-প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করি এবং প্রতিষ্ঠাতার কাছ থেকে সরাসরি এই দায়িত্ব পালনের মানসিক প্রস্তুতি ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার বিরল সুযোগ অর্জন করি। সেই সময় নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত "শিশুদের জন্য বিশ্ব সম্মেলন"-এ অংশগ্রহণ শেষে যখন প্রতিষ্ঠাতা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে বিমানবন্দরে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে বিদায় জানানোর সুযোগ আমার হয়। সেখানে তিনি শুনলেন—দিদি যেখানে ধর্মের বীজ বপন করেছিলেন, সেই শিকাগোতে এবার তাঁরই ছোট বোন শাখা-প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং আমার নামের অর্থ ও তাৎপর্য বিবেচনা করে আশীর্বাদ প্রদান করেন। তিনি স্নেহভরে বললেন—"তুমি পারবে—একদিন এখানে এত মানুষ সমবেত হবে যে শাখা পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। আর যখনই কিছু বলা হবে, 'হ্যাঁ' বলে তা আন্তরিকভাবে পালন করবে।" প্রতিষ্ঠাতার এই আশীর্বাদপূর্ণ কথাগুলো শুনে আমি বিস্মিত হয়ে ভাবলাম—"আমার মধ্যে এমন শক্তি কোথায়!" আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। তবে একই সঙ্গে

তাঁর এই উৎসাহ ও আস্থার মধ্যে আমি আমার ওপর অর্পিত দায়িত্বের গভীরতা ও গুরুত্বও গভীরভাবে অনুভব করেছিলাম।

সেই সময়ে আমি একটি বিমান সংস্থার গ্রাহকসেবা বিভাগে কর্মরত ছিলাম। আমার অন্তরে তখন এক গভীর আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছিল—আমি যেন একজন প্রকৃত শাখাপ্রধানের মতো জীবনযাপন করতে পারি এবং বুদ্ধের সম্মুখে লজ্জিত হতে না হয়। এই সংকল্পকে হৃদয়ে ধারণ করে আমি প্রতিদিন অর্থপূর্ণভাবে দিন অতিবাহিত করতাম। যতই ক্লান্ত থাকি না কেন, সকাল ও সন্ধ্যার বন্দনা কখনোই বাদ দিতাম না। এমনও হয়েছে যে, ক্লান্তিতে বন্দনার মাঝেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি—এমনকি মোমবাতির শিখায় চুল পুড়ে যাওয়ার ঘটনাও একাধিকবার ঘটেছে।

সেই সময়ে আমাদের সংঘবন্ধুদের পরিসর ধীরে ধীরে মিনেসোটা ও মিশিগান পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছিল। "ক্যারাভান" নামে একটি ধর্মপ্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আমরা ব্রাঞ্চপ্রধানের সঙ্গে বিমানবন্দর থেকে প্রায় দশ ঘণ্টার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বিভিন্ন স্থানে গিয়েছি। বিশাল ভূখণ্ডের দেশ আমেরিকায় ধর্মপ্রচারের এই অভিজ্ঞতা ছিল এক অনন্য বাস্তবতা।

শিকাগো শাখায় আমরা নিজেদের একটি দোজো (ধর্মচর্চার কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিলাম। পাঁচ বছরের নিরলস প্রচেষ্টার পর অবশেষে শিকাগোর উপশহর মাউন্ট প্রসপেক্টে আমাদের বহু প্রতীক্ষিত দোজো প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করি। ২০০১ সালে সম্মানিত প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের আগমনে সেখানে পবিত্র বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দোজোর উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। এই অর্জন আমাদের সকলের জন্য ছিল অপরিসীম আনন্দের উৎস। কৃতজ্ঞতায় হৃদয় ভরে উঠেছিল। সেই মুহূর্তে আমি গভীরভাবে অনুভব করেছিলাম—"আমি আজীবন পবিত্র বুদ্ধমুর্তি এবং এই মহামূল্যবান ধর্মশিক্ষাকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করব।"

শিকাগো শাখাটি নিউইয়র্ক ব্রাঞ্চ থেকে বিমানে প্রায় দুই ঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত ছিল। ব্রাঞ্চপ্রধান প্রতি এক বা দুই মাস অন্তর একবার আমাদের শাখায় এসে

২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে, শাখাপ্রধানের দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহনের দিন, শিকাগো শাখার সদস্যদের সাথে।

এক রাত অবস্থান করে ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব পালন করতেন, এবং প্রতিবারই তাঁর উপস্থিতি আমাদের নতুন শক্তি ও অনুপ্রেরণা জোগাত। আমি নিয়মিতভাবে তাঁর কাছে রিপোর্ট প্রদান করতাম ও পরামর্শ গ্রহণ করতাম, এবং সদস্যদের সঙ্গে ব্রাঞ্চপ্রধানের সংযোগ স্থাপনের জন্য একজন বার্তাবাহকের ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতাম।

অন্যদিকে, শাখাপ্রধান হিসেবে আমার অন্তরে উদ্বেগ ও অন্তর্দ্বন্দ্বেরও শেষ ছিল না। বিশেষ করে প্রতি রবিবার অনুষ্ঠিত ইংরেজি ধর্ম আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ও উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। তাঁদের অনেকেই বৌদ্ধধর্মকে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক অধ্যয়নের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে দোজোতে আসতেন। জাপানের তুলনায় ভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত সেই ধর্ম আলোচনাগুলোতে, প্রত্যেকের নিজ নিজ দক্ষতার উপর ভিত্তি করে সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি ও পরামর্শের এক প্রাণবন্ত আদান-প্রদান চলত। তবে আমার অন্তরের গভীরে সর্বদা একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খেত— "শুধুমাত্র পদ্ধতি বা যুক্তির মাধ্যমে কি সত্যিই মানুষের মুক্তি সম্ভব?" এই প্রশ্ন থেকেই আমার মনে একধরনের অস্থিরতা ও সংশয় ক্রমাগত জাগ্রত হতো—আমরা কি সত্যিই সঠিক পথে এগোচ্ছি?

তা সত্ত্বেও, একজন হোজা-পরিচালক হিসেবে আমি ফলাফল অর্জনকেই অগ্রাধিকার দিতাম এবং অনেক সময় তাৎক্ষণিক উত্তর দিয়ে ফেলতাম। যদিও আমি অন্যের অনুভূতি বোঝার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হোজা-প্রধানের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিলাম, বাস্তবে সবকিছু সবসময় পরিকল্পনা অনুযায়ী চলত না। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব অব্যাহতই ছিল।

একদিনের একটি হোজায় ব্রাঞ্চপ্রধান একজন মত প্রকাশকারীকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি তখন কী অনুভব করছিলেন?" এই প্রশ্ন শুনে সেই ব্যক্তি নিজের অনুভূতির কথা বলতে শুরু করলেন। ব্রাঞ্চপ্রধান নীরবে তাঁর কথা শুনছিলেন, মাথা নেড়ে সম্মতি জানাচ্ছিলেন এবং গভীর মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করছিলেন। উপস্থিত সকলেই সেই ব্যক্তির কথায় সম্পূর্ণভাবে মনোযোগী হয়ে পড়েছিল। আমি নিজেও সেই হোজার একজন শ্রোতা ছিলাম।

এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমি ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে শুরু করলাম—"মানুষ যখন নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে, তখনই সে নিজের অন্তরের সত্যকে নিজেই অনুধাবন করতে পারে।" আমি, যে এতদিন না ভেবে বেপরোয়াভাবে ছুটে চলেছিলাম, সেই মুহূর্তে থেমে গিয়ে ধীরে ধীরে শিখলাম—অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা, সংলাপে অংশ নেওয়া এবং হৃদয়ের কথা শোনার গুরুত্ব কত গভীর। এর আগে আমার মধ্যে মানুষের অনুভূতি শোনার মতো পর্যাপ্ত মানসিক প্রশান্তি ছিল না। নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার তাগিদে আমি ভেতরে ভেতরে অস্থির ও দ্বন্দ্বপূর্ণ ছিলাম। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমার সেই অপরিণত সত্তায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসতে শুরু করল।

সময় এগিয়ে চলল। ২০২০ সালে করোনা মহামারির কারণে শাখাটি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। তবে সেই সময়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিউইয়র্ক ব্রাঞ্চের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে অন্য রাজ্যে বসবাসকারী সদস্যদের সঙ্গেও একসাথে শিক্ষা গ্রহণের নতুন এক যুগের সূচনা হয়। আমি মনে মনে অনুভব করেছিলাম—"আমরা এমন এক সময়ে এসে পৌঁছেছি, যা কল্পনাও করা যায়নি।" এই বৃহৎ পরিবর্তনকে আমি বুদ্ধের করুণাময় ব্যবস্থারই প্রকাশ হিসেবে অনুভব না করে পারিনি।

শিকাগো শাখাটি এমন একটি স্থান, যেখানে প্রতিটি সদস্য নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। যেন সহস্রহস্ত অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বর মতো, প্রত্যেকে নিজের নিজস্ব গুণকে কাজে লাগিয়ে এখানে এক অসাধারণ ধর্মপ্রচারের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে—এ কথা আমি এখন অন্তরের গভীর থেকে বিশ্বাস করি। আমি সঙ্ঘের প্রতিটি সদস্যের সহায়তায়ই আমার দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি—এই অনুভূতিতে আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ। শিকাগোর এই সঙ্ঘই আমার গর্ব।

পেছনে ফিরে তাকালে দেখি, শিকাগোতে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্তটি মূলত আমার স্বামীর সঙ্গে পরিচয়ের ফল। তিনি আমার চেয়ে ১৮ বছর বড় ছিলেন। তাঁর সঙ্গে করা "পরিবারকে মূল্য দেওয়া" এই প্রতিশ্রুতিকে হৃদয়ে ধারণ করে আমি দীর্ঘ বছর ধরে পরিবার, কর্মজীবন এবং ধর্মীয় দায়িত্ব—এই তিনটিকেই সমানভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছি।

আমি যদিও কথায় কঠোর মা ছিলাম, তবুও উদার, স্নেহশীল এবং পরিবারপ্রেমী স্বামীর স্নেহপূর্ণ ছায়ায় আমাদের পরিবার এগিয়ে চলেছিল। বড় হয়ে আমার ছেলে পুলিশ অফিসার হয়েছে, এবং অবসর নেওয়ার পর বর্তমানে তিনি পুলিশ কর্মকর্তাদের জুডো প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব পালন করছে। আমার মেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। তারা দু'জনই এমন মানুষে পরিণত হয়েছে যারা সবসময় কষ্টে থাকা বা সমস্যায় পড়া বন্ধুকে উপেক্ষা করতে পারে না—বরং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এমন উষ্ণ হৃদয়ের অধিকারী। আর আমি যখন নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতাম, তখন আমার স্বামী সবসময় নীরবে আমার পাশে থেকে আমাকে সমর্থন করেছেন।

আমার স্বামী ২০০২ সালের ৩০ মার্চ ৭৫ বছর বয়সে রেক্টাল ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। বাড়িতেই তিনি হসপিস কেয়ারের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করেছিলেন। সন্তানদের সঙ্গে মিলে আমরা তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেছিলাম। সেই দুই মাসে তিনি কোনো তীব্র যন্ত্রণা বা কষ্ট ছাড়াই, পরিবারের স্নেহে পরিবেষ্টিত হয়ে শান্তভাবে সময় কাটাতে পেরেছিলেন—এই স্মৃতি আজও তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমার হৃদয়ের শক্তি হয়ে আছে। বর্তমানে আমার মেয়ের পরিবার আমার সঙ্গে একই বাড়িতে বসবাস করছে। এখন আমাদের বাড়িতে যখনই সন্তানরা একত্রিত হয়, আমরা সবাই অবশ্যই তাঁদের বাবাকে স্মরণ করি এবং তাঁর স্মৃতি নিয়ে গল্প করি। এভাবেই আমাদের পরিবারে তাঁর উপস্থিতি আজও জীবন্ত। এ পর্যন্ত যে অসংখ্য সম্পর্ক আমি পেয়েছি, জীবনের নানা দ্বন্দ্ব, কষ্ট ও আনন্দ—সবই আমার কাছে বুদ্ধের প্রদত্ত অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠেছে।

ভবিষ্যতে আমি শাখার একজন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি, জাপানি-আমেরিকান সেবা কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবী কাজ অব্যাহত রেখে সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করতে চাই।

রোম হোজার সংঘবন্ধুদের সাথে (ডান দিক থেকে চতুর্থ)

দৈনন্দিন জীবনে দশস্বরূপতা: স্বতন্ত্র ফল স্বতন্ত্র পরিণাম, সর্ববিষয়ের পূর্ণ সমন্বয়

গত মাসের ধারাবাহিকতায় রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা ড. ডমিনিক স্কালাঞ্জেলো এর রচিত "এখানেই সাধনাক্ষেত্র" শীর্ষক ভাবনাটি এখানে উপস্থাপন করা হলো। "এখানেই সাধনাক্ষেত্র"—এই ধারণাটি সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের "তথাগতের দৈবশক্তি" অধ্যায়ে বর্ণিত সেই শিক্ষার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে কোনো স্থানই সাধনার ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। "এখানেই, এখনই সাধনার ক্ষেত্র"—এই শিক্ষা আমাদের নীরবে অনুপ্রাণিত করে, যেন পরিবার, কর্মক্ষেত্র, বিদ্যালয় অথবা দৈনন্দিন জীবনের যেকোনো পরিসরেই আমরা ধর্মবাণীকে বাস্তবে প্রয়োগ করি এবং বোধিচিত্তকে জাগ্রত করি।

ডঃ ডমিনিক স্কারাঞ্জেলো

এই মাসে আমরা "স্বতন্ত্র ফল", "স্বতন্ত্র পরিণাম" এবং "শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ সামঞ্জস্য"—এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করব, যাতে "দশস্বরূপতা"-র শিক্ষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সহজে প্রয়োগযোগ্য হয়ে ওঠে।

রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিও নিওয়ানো মহোদয় ব্যাখ্যা করেন—"ফল" বলতে সেই ফলাফলকে বোঝায়, যা কোনো নির্দিষ্ট হেতু (কারণ) ও প্রত্যয় (শর্ত)-এর সমন্বয়ে একটি কার্য সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র—নতুন ব্যাখ্যা, অনুচ্ছেদ ২০৪)

অর্থাৎ, আমাদের প্রতিটি কাজের একটি তাৎক্ষণিক ও প্রত্যক্ষ ফল থাকে—এটাই "স্বতন্ত্র ফল"। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, আপনি কম্পিউটার কাজ করছেন। অসাবধানতাবশত কীবোর্ডের উপর এক কাপ কফি পড়ে গেল, এবং কফি যন্ত্রের ভেতরে ঢুকে সেটিকে নষ্ট করে দিল।

এখানে—আপনার অসাবধানতা (স্বতন্ত্র প্রকৃতি) এই ঘটনার সম্ভাবনা (স্বতন্ত্র শক্তি) সৃষ্টি করেছে, পাশে রাখা কফির কাপ একটি শর্ত (স্বতন্ত্র প্রত্যয়) হিসেবে কাজ করেছে, আপনার অসতর্ক হাতের নড়াচড়া (স্বতন্ত্র হেতু) এই তিনটির মিলনে, একই কাজ (হাতের নড়াচড়া) অন্য পরিস্থিতিতে কোনো সমস্যা না করলেও, এখানে কম্পিউটার নষ্ট হওয়ার ফল সৃষ্টি করেছে। এই সরাসরি ফলই হলো "যেমন ফল (স্বতন্ত্র ফল)"।

এখন প্রশ্ন—"স্বতন্ত্র পরিণাম" বলতে কী বোঝায়? প্রতিষ্ঠাতা নিওয়ানো বলেন—"ফলাফল কেবল ঘটেই শেষ হয় না; এটি পরবর্তীতে কোনো না কোনো দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে যায়।" (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র—নতুন ব্যাখ্যা, অনুচ্ছেদ ২০৪)

উপরের উদাহরণে—কম্পিউটারের উপর কফি পড়ে যাওয়ার ফলে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব সৃষ্টি হয়, যেমন—কম্পিউটার মেরামত বা নতুন করে কেনার প্রয়োজন, এর জন্য আর্থিক চাপ, কিংবা কিছুদিন কম্পিউটার ব্যবহার করতে না পারার অসুবিধা, এই ধারাবাহিক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবগুলোই হলো "যেমন প্রতিফল (স্বতন্ত্র পরিণাম)"।

এটি দৈনন্দিন জীবনের একটি ছোট উদাহরণ মাত্র। কিন্তু এখান থেকে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই— "হেতু" ও "প্রত্যয়" এর মিলনে "ফল" ও "পরিণাম" জন্ম নেয়—এই ধারাবাহিক প্রবাহটি কীভাবে কাজ করে। এখানে আমাদের সুখের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো— এই প্রবাহটিকে আমাদের মানবসম্পর্কের মধ্যে উপলব্ধি করা।

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, ধরা যাক—একটি ট্রেন বা বাসে একজন কিশোর একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে নিজের আসন ছেড়ে দিচ্ছে। এই ঘটনাটির সূচনায়, সেই কিশোরের মনে কী জন্মায়? সম্ভবত, সে একটি সৎ কাজ করার ফলে অন্তরে এক ধরনের সন্তুষ্টি অনুভব করে। এরপর, সেই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার মনে আরও বেশি করে মানুষের উপকার করতে চাওয়ার ইচ্ছা জাগতে পারে। এবং ধীরে ধীরে, এই প্রবণতা তার অন্তরে বোধিসত্ত্বের করুণাময় হৃদয়কে লালন করে, যা একসময় তাকে একজন সহানুভূতিশীল, পরোপকারী মানুষে পরিণত করে। এই ধরনের অন্তরের পরিবর্তনই হলো "স্বতন্ত্র পরিণাম"। তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের উপলব্ধি করতে হবে—যখন আমরা বলি, অন্তরের "মনের পরিবর্তন"ই হলো "স্বতন্ত্র পরিণাম", তখন এর অর্থ দাঁড়ায়—ভালো কাজ করার মাধ্যমে আমাদের "স্বতন্ত্র প্রকৃতি"ও পরিবর্তিত হয়।

অর্থাৎ বলা যায়, "দশস্বরূপতা" একটি বৃত্তাকার চক্র বা সার্কিটের মতো কাজ করে। অর্থাৎ "স্বতন্ত্র

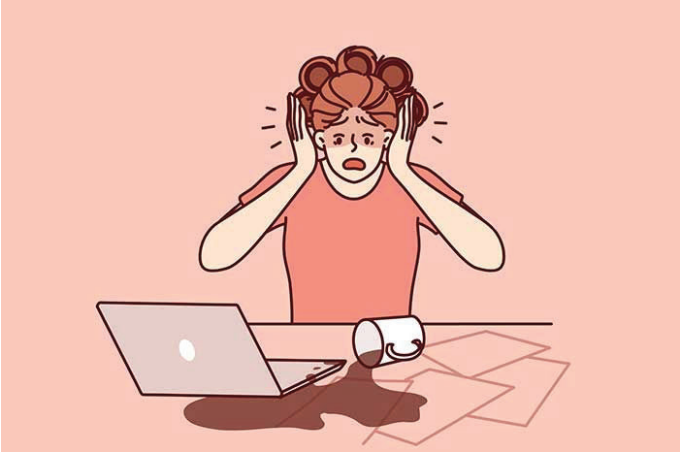

পরিণাম" আবার ফিরে এসে আমাদের "স্বতন্ত্র অবয়ব" ও "স্বতন্ত্র প্রকৃতি"কে প্রভাবিত করে, এবং সেখান থেকে আবার "স্বতন্ত্র শক্তি" এবং তার পরবর্তী পরিবর্তনের দিকে যুক্ত হতে থাকে। আমাদের কাজের ফলাফল আমাদের চরিত্রকে গঠন করে, এবং সেই চরিত্র আবার ভবিষ্যতের কাজকেও প্রভাবিত করে। "দশস্বরূপতা" এর নীতি অনুযায়ী জীবনযাপন করা মানে হলো—এই আত্মউন্নয়নের ধারাবাহিক চক্রকে সচেতনভাবে উপলব্ধি করা, এবং সেটিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা। অর্থাৎ, আমাদের চিন্তা ও আচরণকে যদি বুদ্ধের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায়, তাহলে আমাদের চরিত্র ধীরে ধীরে উন্নত হয়। এর ফলস্বরূপ আমরা আরও সুখী, পরিপূর্ণ এবং অর্থবহ জীবন লাভ করতে পারি। এইভাবে আমরা একটি ইতিবাচক ও কল্যাণময় জীবনচক্র তৈরি করতে সক্ষম হই। এটাই হলো "দশস্বরূপতা" এর নিয়ম অনুযায়ী জীবনযাপনের প্রকৃত অর্থ।

তবে, আমরা যদি কোনো অনুচিত কাজ করে নিজেরাই দুঃখ বা দুর্ভোগ ডেকে আনি, তবুও সেটিই শেষ কথা নয়। দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব হিসেবে "স্বতন্ত্র পরিণাম" সবসময়ই নেতিবাচক থাকবে—এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আমরা ফলাফল ও তার প্রভাবকে কীভাবে ব্যাখ্যা করি এবং কীভাবে তার প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাই—তার ওপরই নির্ভর করে সেই নেতিবাচক বিষয়কে ইতিবাচকে পরিবর্তন করা সম্ভব। যখন আমরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারি, অনুশোচনা করি এবং নিজেদের সংশোধন করি (অনুতাপ/প্রায়শ্চিত্ত), তখন এমনকি আমাদের অজ্ঞতা বা অপরিপক্ক আচরণের ফলে যে ফল ও প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল, সেটিও মূল্যবান শিক্ষায় পরিণত হয়। এভাবে তা আমাদের আত্মিক উন্নতি ও জ্ঞানের পথে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়ে ওঠে, এবং দুঃখের অভিজ্ঞতাও করুণা ও প্রজ্ঞার বীজে রূপান্তরিত হয়।

এই কারণেই প্রতিষ্ঠাতা নিওয়ানো আমাদের শিখিয়েছেন—"আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে, সবকিছুকেই সুখের কারণ হিসেবে দেখা" কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ("প্রতিষ্ঠাতাকে অনুসরণ", ৩৪ নং অনুচ্ছেদ)। কোনো "হেতু" ভালো "ফল" এ পরিণত হবে কি না, তা অনেকাংশেই আমাদের নিজেদের হৃদয়ের অবস্থার উপর নির্ভর করে। আনন্দের অভিজ্ঞতা হোক বা কষ্টের অভিজ্ঞতা—সবকিছুকেই যদি আমরা আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধির উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করি, তবে প্রতিটি অভিজ্ঞতাই আমাদের উন্নতির উপাদানে পরিণত হয়। আমরা অতীতের ঘটনাকে পরিবর্তন করতে পারি না, কিন্তু আমরা তার অর্থ ও প্রভাব—অর্থাৎ "স্বতন্ত্র পরিণাম"—নিশ্চয়ই পরিবর্তন করতে পারি।

"দশ স্বতন্ত্র নীতি"–এর প্রতিটি উপাদান আলাদা বা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। বরং, এটি আমাদের সব ধরনের অভিজ্ঞতা ও ঘটনাপ্রবাহের বিভিন্ন দিককে সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার একটি পদ্ধতি। এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক অনেকটা একটি সোয়েটারের বুননের মতো। যেমন সোয়েটারের একটি সুতো টান দিলে আশেপাশের বুননগুলোও তার সঙ্গে নড়ে ওঠে। ঠিক তেমনই—আমাদের অন্যের প্রতি আচরণ, মুখের অভিব্যক্তি, কণ্ঠের স্বর, বা উত্তর দেওয়ার ধরন—এর মধ্যে যেকোনো একটি পরিবর্তন হলেই পুরো মানবসম্পর্কের অবস্থাই বদলে যেতে পারে। তাই, আমরা যদি আমাদের অতীতের সম্পর্ক ও অভিজ্ঞতাগুলোকে ফিরে দেখি এবং নিজেদের সংশোধন করি, তাহলে বহু বছর পরেও আমরা এই উপলব্ধিতে পৌঁছাতে পারি যে, আমাদের জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাই আসলে আমাদের বোধিজ্ঞান লাভের জন্যই ছিল।

এইভাবে, "দশ স্বতন্ত্র নীতি"–এর মধ্যে শুরু (মূল) থেকে শেষ পর্যন্ত যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান, তাকে বলা হয়—"শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্ব বিষয়ের সমন্বয়"। ('সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের নতুন ব্যাখ্যা' পৃষ্ঠা ২০২। এখানে প্রতিটি দিকই সমগ্র গতিপ্রবাহকে প্রভাবিত করে। আমাদের জন্য এর তাৎপর্য হলো—এই বিষয়টি মনে রেখে যদি আমরা দৈনন্দিন জীবনে ধর্মচর্চা করি, তাহলে আমরা সচেতনভাবে বর্তমানের ফলাফল এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব—উভয়কেই পরিবর্তন করতে পারি। ফলস্বরূপ—আমাদের জীবন ধীরে ধীরে মুক্তি ও জ্ঞানলাভের পথে এগিয়ে যায়।

সংঘের কার্যক্রমের প্রতিবেদন

রেভারেন্ড সাহো লি,
মিনিষ্টার, রিসসো কোসেই-কাই সানফ্রান্সিসকো।

২০২৩ সালে সান ফ্রান্সিসকো ধর্ম কেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণের পর, আমি প্রথমবারের মতো কেন্দ্রের মাসিক নিউজলেটারে লেখার সুযোগ পাই। সেই লেখায় আমি সদস্যদের কাছে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রে বর্ণিত কার্যকারণ (কারণ-প্রত্যয়) সম্পর্কের শিক্ষা প্রতিষ্ঠাতার সহজ ও করুণাময় ভাষায় তুলে ধরার প্রয়াস করি।

বিশেষকরে আমি প্রতিষ্ঠাতার "ভালো কর্ম, ভালো ফল" শিক্ষার কথা উল্লেখ করি—যেখানে বলা হয়, আমাদের চারপাশের মানুষ ও ঘটনাগুলোকেই সর্বদা "ভালো হেতু" ও "ভালো প্রত্যয়" হিসেবে দেখা উচিত। এই ভাবনার আলোকে আমি আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি তুলে ধরি:

জীবনে অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটে যা আমাদের ইচ্ছার সাথে মেলে না। তখন আমরা সহজেই ধরে নিই—এর পেছনে নিশ্চয় কোনো খারাপ কারণ রয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতার শিক্ষা আমাদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। তিনি বলেন, প্রতিটি ফলই সেই মুহূর্তে আমাদের জন্য উপযুক্ত এক অভিজ্ঞতা। আমরা যদি ফলাফলকে ভালো বা মন্দ বলে বিচার না করে বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করি, তবে সেই অভিজ্ঞতাই "ভালো কারণ"-এ রূপ নেয় এবং ভবিষ্যতে "ভালো ফল"-এর বীজ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, এই বিশ্বে প্রকৃতপক্ষে কোনো "খারাপ কারণ" বা "খারাপ ফল" নেই—সবই আমাদের উন্নতির পথে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

এই উপলব্ধি আমি আমার দায়িত্ব গ্রহণের প্রারম্ভিক ভাষণেও সদস্যদের সাথে ভাগ করে নিয়েছিলাম।

সম্প্রতি "সংঘ কার্যক্রম প্রতিবেদন"-এর জন্য লেখার আমন্ত্রণ পেয়ে, দায়িত্ব গ্রহণের তিন বছর পর নিজের পথচলা ফিরে দেখার এক মূল্যবান সুযোগ পেলাম। তখন আমি গভীরভাবে অনুভব করি—যে শিক্ষা আমি অন্যদের কাছে তুলে ধরেছিলাম, সেটিই আসলে আমার নিজের জীবনের জন্যও এক গুরুত্বপূর্ণ দিশা। প্রতিদিনের ঘটনাগুলোকে আমি কি সত্যিই নিজের বিকাশের জন্য "ভালো কারণ" হিসেবে গ্রহণ করতে পারছি?—এই প্রশ্ন আমাকে অন্তর্দর্শনের পথে নিয়ে যায়।

একদিন, সান ফ্রান্সিসকো ধর্ম কেন্দ্রের একজন সদস্য তার পারিবারিক সমস্যার কথা শেয়ার করেন। তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন, কারণ তিনি যা সঠিক মনে করতেন, তা তার পরিবার গ্রহণ করছিল না। আমি তাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম—শুধু নিজের কথা বলার পরিবর্তে পরিবারের অনুভূতিকেও বোঝার চেষ্টা করতে। কিন্তু তিনি সেই পরামর্শ গ্রহণ করতে পারলেন না। ফলে, আমাদের আলোচনাও এগোয়নি। এতে আমার মনে কিছুটা অস্বস্তি ও হতাশা জন্ম নেয়।

কিন্তু পরে যখন আমি কার্যকারণ সম্পর্কের শিক্ষা নিয়ে ভাবতে শুরু করি, তখন হঠাৎ উপলব্ধি করি—আমি নিজেও তো তার মতোই আচরণ করছি! আমিও নিজের ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে তার অবস্থান থেকে বিষয়টি বুঝতে পারিনি। তখন আমি দৃষ্টিভঙ্গি বদলাই। বুঝতে পারি, তার আমার কথা না শোনা কোনো সমস্যা নয়; বরং এটি আমার জন্য একটি "ভালো কারণ"—যা আমাকে অন্যের অবস্থান থেকে ভাবতে শেখাচ্ছে। আমি তাকে বললাম, "আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম, তবে হয়তো আমিও এই পরামর্শ সহজে গ্রহণ করতে পারতাম না।" এই আন্তরিক স্বীকারোক্তি তার হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। আমি অনুভব করলাম, তার মন কিছুটা কোমল হয়ে উঠেছে। সেই মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করি—অন্যকে বোঝার আগে নিজেকে বদলানোই প্রকৃত সাধনা।

আজও এমন অনেক সময় আসে, যখন আমার কথা অন্যের কাছে সম্পূর্ণভাবে পৌঁছায় না। তবে আমি এখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি—আমি যত নিজেকে পরিশুদ্ধ ও উন্নত করতে পারব, ততই আমার কথা অন্যদের হৃদয়ে পৌঁছাবে।

অসংখ্য সদস্যের সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তাদের সঙ্গে পথচলার মধ্য দিয়ে আমি শিখছি, বেড়ে উঠছি। ভবিষ্যতেও এই কৃতজ্ঞতা হৃদয়ে ধারণ করে, ধর্মের পথে অবিচল থেকে নিজেকে শুদ্ধ করার সাধনা অব্যাহত রাখার আশা রাখি।

তথাগতের চীবর পরিধান

"ক্ষান্তি"–অপরের প্রতি মমতার বহিঃপ্রকাশ

রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

তথাগতের চীবর হলো 'ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার অন্তর'। "বিনয়"–এর পর যে গুণের কথা বলা হয় তা হলো "ক্ষান্তি", যার অর্থ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। দৈনন্দিন জীবনের চাপ, মান-অভিমান, বিরোধ, অবজ্ঞা—এই সব কিছু শান্ত মনে সহ্য করাই এর মর্মার্থ। অন্যভাবে বললে, ধৈর্য না থাকলে হৃদয় কখনো কোমল হয় না।

সাম্প্রতিক সময়ে মনে হয় এই ধৈর্যচর্চা যেন ক্রমেই অবহেলিত হচ্ছে। তুচ্ছ ঘটনা নিয়েও মানুষের রাগ এতটাই বেড়ে যায় যে তারা হিংস্র আচরণে জড়িয়ে পড়ে—ছুরি দিয়ে আঘাত, বা পিটিয়ে হত্যা পর্যন্ত। আমার মতো মেইজি যুগের মানুষের কাছে এমন ঘটনা ছিল একেবারেই অকল্পনীয়।

আমি প্রায়ই বলি—আজকের স্বচ্ছলতার যুগে আমরা অনেকেই নিজের সুবিধামতো মূল্যবোধ তৈরি করছি, ফলে অন্যকে বোঝার, সহমর্মিতা দেখানোর মানসিকতা হারিয়ে ফেলছি। আমরা প্রত্যেকেই কখনো না কখনো রাগে ফেটে পড়ি। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে যদি কেউ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, প্রতিবার তার মনে নতুন প্রশস্ততা জন্মায়—মানুষ হিসেবে সে আরও পরিণত হয়ে ওঠে।

একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছি। ১৯২৯ সালের দিকে নৌবাহিনীতে চাকরি করার সময় আমাকে নতুন নাবিকদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তখনকার নৌবাহিনীতে শারীরিক শাস্তি ছিল নিত্যদিনের বিষয়—চড়-থাপ্পড়, এমনকি 'স্পিরিট স্টিক' নামে পরিচিত লাঠি দিয়ে জ্ঞান হারানো পর্যন্ত মারা হতো। কিন্তু আমি নতুনদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম— "আমি কখনো তোমাদের মারব না।" এ প্রতিশ্রুতি শুধু তাদের জন্য ছিল না—এ ছিল আমার নিজের প্রতিজ্ঞাও।

প্রশিক্ষক হিসেবে আমি প্রথমেই নিজের আচরণকে শুদ্ধ রাখতাম এবং যেকোনো বিষয়ে আলোচনা করার পরিবেশ তৈরি করতাম। উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আমাকে উদ্ধত মনে করতেন। একদিন, একজন নতুন নাবিকের একটু ঢিলেমি দেখে এক ডেক অফিসার চেঁচিয়ে বললেন— "নিওয়ানো! তুমি চড় মারো না বলেই ওরা এমন হচ্ছে!" বলেই তিনি সবার সামনে আমাকে চড় মারলেন। তবুও আমি আমার পথ থেকে সরে যাইনি। অহিংসার নীতি আঁকড়ে রেখেছি। আমাকে মারা হলেও আমি নতুন নাবিকদের পক্ষ নিয়েছি। এ দৃশ্য দেখে তাদের মন-মানসিকতা বদলে গেল—তারা বুঝতে পারল, সহিষ্ণুতা ও মমতার শক্তি শুধু উপদেশে নয়, আচরণেই মানুষকে বদলে দিতে পারে।

নিওয়ানো নিক্কিও বাণী সংগ্রহ ১, 'বোধিবীজকে জাগ্রত করা' পৃ. ১৮-১৯।

অন্যের কল্যানে বেঁচে থাকার আনন্দ

রেভারেন্ড তাকাশি মায়েদা
পরিচালক, রিস্‌সো কোসেই-কাই আন্তর্জাতিক মিশন।

নমস্কার। মার্চ থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত আমি যুক্তরাজ্য, ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্র ও তাইওয়ান ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলাম। এই সফরে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের সংঘ-বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য হয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো—যাদের সঙ্গে প্রথমবার দেখা, তাদের সঙ্গেও যেন বহুদিনের পরিচয়ের মতো এক আন্তরিক উষ্ণতা অনুভব করেছি। গভীরভাবে চিন্তা করে উপলব্ধি করলাম, এর মূল কারণ ছিল—আমাদের একে অপরকে বোঝার আন্তরিক প্রয়াস। ভাষা ও সংস্কৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও "পরস্পরকে বুঝতে চাই" এই সাধারণ মনোভাবই মানুষকে মানুষে স্বাভাবিকভাবে যুক্ত করে।

মানুষ মূলত সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বাঁচার জন্যই সৃষ্টি। কিন্তু বর্তমান সময়ে দেখা যায়, আমরা নিজেদের মূল্যবোধকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে অনেক সময় অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা এড়িয়ে চলি। এর ফলে আমাদের মধ্যে একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে "সত্যিকারের সুখ কী"—এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানীদের এক গবেষণা আমাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ যখন নিজের জন্য ব্যয় করে এবং যখন অন্যের জন্য ব্যয় করে—এই দুইয়ের তুলনায়, যারা অন্যের জন্য ব্যয় করে, তারা অধিক গভীর ও স্থায়ী সুখ অনুভব করে।

আমরা সাধারণত "পাওয়ার" মধ্যেই সুখ খুঁজে থাকি। কিন্তু প্রকৃত সুখ লুকিয়ে আছে "দেওয়ার" মধ্যে—অর্থাৎ অন্যের প্রতি মমতা, সহানুভূতি ও যত্নশীলতার মধ্যে। বুদ্ধের করুণাময় শিক্ষা আমাদের এ কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একটি ছোট দয়ার কাজ বা একটি আন্তরিক বাক্য যেমন অন্যের হৃদয়কে উষ্ণ করে তোলে, তেমনি আমাদের নিজের মনকেও সমৃদ্ধ করে। "এই মানুষটির জন্য"—এই একটিমাত্র আন্তরিক ভাবনাই সৃষ্টি করে গভীর সংযোগ। এই সংযোগ শুধু অন্যের কল্যাণেই নয়, আমাদের নিজের মনকেও মুক্ত করে এবং আমাদের প্রকৃত সুখের পথে পরিচালিত করে।

১লা এপ্রিল থাইনান ব্রাঞ্চ (উপরে), ২রা এপ্রিল থাইপেই ব্রাঞ্চের সদস্যদের সাথে তোলা ছবি।

Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter

A Global Buddhist Movement

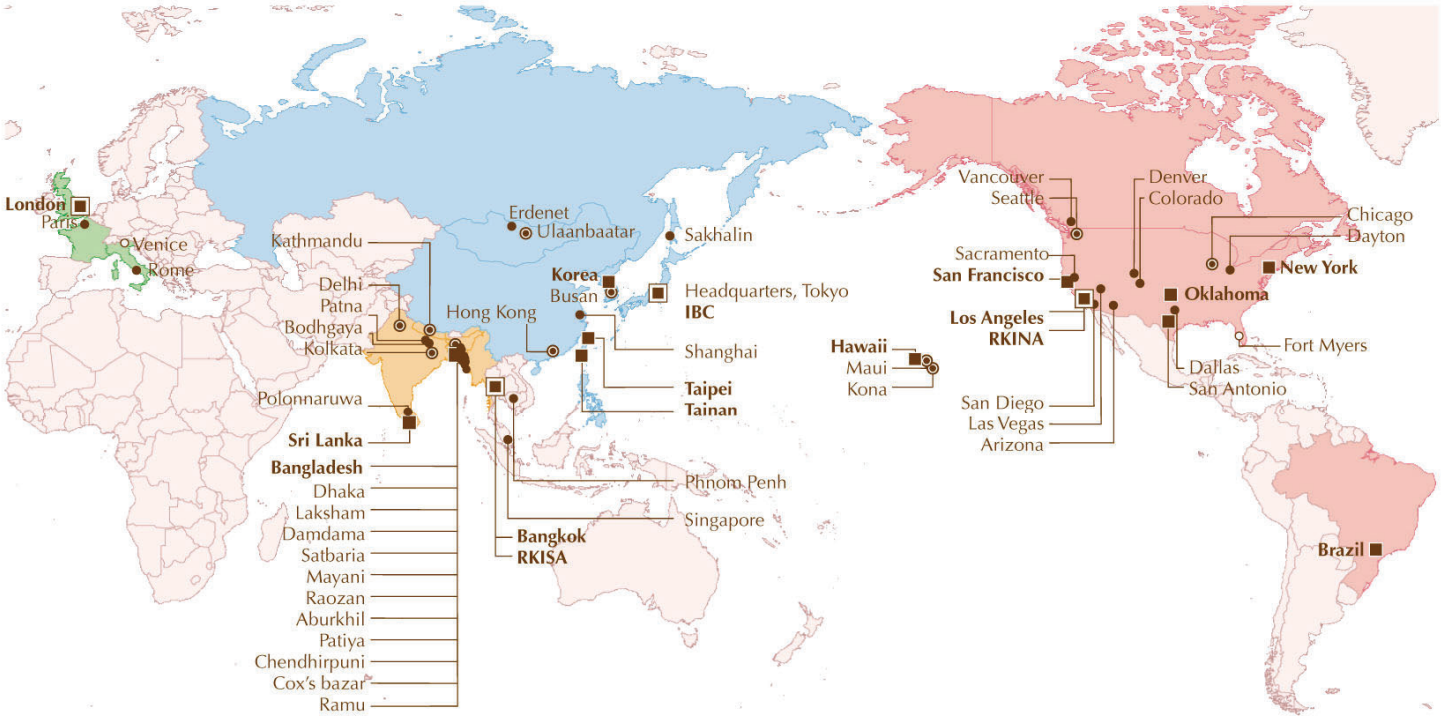

Information about local Dharma centers

facebook

X

We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp